মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব-৭

বিরঞ্জন রায়

উপসংহার

থিসিস পর্যায়ে মার্ক্সের দার্শনিক বিকাশটি অনুধাবনের পর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, মার্ক্স তার দর্শনে এপিকুরস থেকে কী গ্রহণ করেছেন ? এর উত্তরে যদি বলা হয়, মার্ক্স হেগেল থেকে বস্তুবাদ এবং এপিকুরস থেকে ভাববাদ গ্রহণ করেছেন। তা শোনা মাত্র অবিশ্বাস্যই মনে হবে। কিন্তু ব্যাপারটি তাই। হেগেল ভাববাদের (আবশ্যিকতার গন্ডি মুক্ত বিষয়ী বা মনই যেখানে মূল সত্তা) বিকাশ ঘটিয়ে বস্তুবাদে পৌঁছেছিলেন। তা হল, ভাব তথা বিশ্বের বিকাশের নিয়মের বিষয়গততা এবং আবশ্যিকতা। লেনিন তার 'Philosophical Note Books'-এ হেগেলের 'লজিক' সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'in this most idealistic of Hegel's works there is the least idealism and the most materialism. 'Contradictory' but fact!' (হেগেলের সবচেয়ে ভাববাদী এ রচনাটিতে রয়েছে সবচেয়ে কম ভাববাদ ও সবচেয়ে বেশী বস্তুবাদ। 'স্ববিরোধী' কিন্তু সত্যি!) হেগেলীয় এই বস্তুবাদে যে ভাববাদী খাদ মিশ্রিত ছিল, ফয়েরবাখের আগুনে তা দূর হয়ে যায়। মার্ক্স ফয়েরবাখের আগুনে পরিশুদ্ধ হেগেলীয় বস্তুবাদকেই গ্রহণ করেছিলেন। বিপরীতে এপিকুরস বস্তুবাদের (আবশ্যিকতার অধীন বিষয় যেখানে মূল সত্তা) বিকাশ ঘটিয়ে ভাববাদে পৌঁছেছিলেন। পরম মুক্ত বিষয়ী এবং আপতিকতা/আকস্মিকতাই যার সারমর্ম। মার্ক্স হেগেলের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বের বিকাশের বিষয়গত দ্বান্দ্বিক নিয়ম; আর এপিকুরসের নিকট থেকে মুক্ত বিষয়ী এবং আপতিকতা/আকস্মিকতাকে। মার্ক্স তার দর্শনে বিষয় ও বিষয়ীকে এবং আবশ্যিকতা ও আপতিকতা/আকস্মিকতাকে দ্বান্দ্বিক ঐক্যে সংশ্লেষিত করেছিলেন। প্রাচীন বস্তুবাদের 'বস্তু'র স্থলে 'সক্রিয় বিষয়ী'ই হয়েছিল তার দর্শনের কেন্দ্র।

হেগেলের মতে বিশ্ব-ইতিহাস চিরন্তন বুদ্ধি বা স্বয়ং ধারণার দ্বারা চালিত। মানুষ যেন বিশ্ব-ইতিহাস নামক সত্তার পুতুলনাচের পুতুল। বিপরীতে ১৮৪৬ সনেই মার্ক্স লিখেছেন, 'ইতিহাস কিছুই করে না। ইতিহাস প্রভুত সম্পদও ধারণ করে না; ইতিহাস যুদ্ধেও নিয়োজিত হয় না। জীবন্ত বাস্তব মানুষই সব করে। মানুষই সব ধারণ করে এবং সংগ্রাম করে। মানুষ তার লক্ষ্য অর্জনে যে সব ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত হয়, সে সবের বাইরে ইতিহাস বলে কিছু নেই।' মার্ক্স যে ইতিহাসের কোনো অমোঘ নিয়মকে নয়; সক্রিয় বিষয়ীকেই তার দর্শনের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন, এটি তারই নিদর্শন।

হেগেল সত্তাসার (essence) সম্পর্কে আলোচনায় বলেন, সত্তাসার অর্থাৎ আবশ্যকীয় (necessity) এবং অবান্তর গুণ (accident) তথা প্রতিভাসের (appearance) মধ্যে সম্পর্কটি দুই দিক দিয়ে বিবেচনা করা যায়। আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয়ের ভিত্তি। কিন্তু অনাবশ্যকীয় না থাকলে আবশ্যকীয় কারো ভিত্তি হতে পারত না। তাই এ-দুটি পরস্পর নির্ভর। কিন্তু ইতিহাস বিশ্লেষণের সময় হেগেলই বলেন, বিশ্ব-ইতিহাস দৈব/আপতিক (chance) দ্বারা চালিত নয়। ইতিহাসের আবশ্যিক বিকাশের ধারায় অবান্তর/আপতিক (accident) অনেক কিছু ঘটে। এসবকে 'প্রকৃত' তথা 'বৌদ্ধিক' বলে বিবেচনা করা যায় না। এ-বিবেচনায় হেগেল-বর্ণিত ইতিহাসের বিকাশের ধারায়, ইউরোপের ইতিহাসই 'প্রকৃত' তথা 'বৌদ্ধিক' বলে বিবেচিত হয়। বাদবাকি বিশ্বের ইতিহাস 'অবান্তর' তথা 'আপতিক' বিবেচনায় পরিত্যক্ত হয়।

আপতিকতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রীক দার্শনিকগণ সচেতন ছিলেন। কিন্তু তারা আপতিকতাকে বিশ্বের আবিশ্যিক নিয়ম বলে গণ্য করেননি। ব্যতিক্রম এপিকুরস। তিনি আপতিকতাকেই তার দর্শনের মূলনীতি করেছিলেন। এ-বিষয়টিকে হেগেল গ্রীক দর্শন পর্যালোচনার সময় গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইউরোপের আধুনিক দার্শনিকগণ এপিকুরীয় দর্শনের এ-দিকটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন নি। তারা বরং দেমক্রেতীয় পরমাণুবাদে আপতিকতা (পরমাণুর আকস্মিক বিচ্যুতি) আমদানি করার দায়ে এপিকুরসকে অভিযুক্ত করেছেন। মার্ক্সই প্রথম এপিকুরীয় দর্শনের এ-দিকটির গুরুত্ব অনুধাবন করেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানে আপতিকতাকে আবশ্যিক নীতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় কোয়ান্টম বলবিদ্যায়। মার্ক্স দেখান, এপিকুরস বিষয়ীর চেয়ে বিষয়কে বেশী গুরুত্ব দেন নি এবং সম্ভাব্যতা ও আপতিকতাই এপিকুরীয় দর্শনের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। তিনি এসবের উচ্চ মূল্যায়ন করেন। তার নোট বইয়ে পাচ্ছি, 'এপিকুরসে যা স্থায়ী ও মহান তা হল, তিনি প্রত্যয়ের (notions) চেয়ে অবস্থাকে (conditions) অগ্রাধিকার দেন না এবং এসব রক্ষার জন্য সামান্যই চেষ্টা করেন। এপিকুরসের জন্য দর্শনের কাজ এটি প্রমাণ করা যে, বিশ্ব এবং চিন্তা, চিন্তাযোগ্য এবং সম্ভাব্য। এপিকুরস যে প্রমাণ দেখান, যে নীতির ভিত্তিতে তিনি অগ্রসর হন এবং তিনি যার বরাত দেন, সবই সম্ভাব্যতা; যে সম্ভাব্যতা নিজের জন্যই অস্তিত্বশীল। এই স্বয়ম্ভর সম্ভাব্যতার প্রাকৃতিক প্রকাশ পরমাণু এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশ আপতিকতা ও যদৃচ্ছা।'

মার্ক্স এপিকুরসের সমালোচনা করেন, এপিকুরস আপতিকতাকে আবশ্যিকতার সঙ্গে মেলাতে পারেননি বলে। তিনি হেগেলের ইতিহাসের আবশ্যিকতা এবং এপিকুরসের প্রকৃতির আপতিকতাকে দ্বান্দ্বিক ঐক্যে মিলিয়েছিলেন। ইতিহাসের একটি ঘটনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি ১৮৭১ সনে বন্ধু কুলেগমানকে লিখেছিলেন: 'আপতিকতার যদি কোনো ভূমিকা না থাকত তাহলে ইতিহাস অত্যন্ত অতীন্দ্রিয় প্রকৃতির হয়ে উঠত। এই আপতিকতা স্বভাবতই সাধারণ বিকাশধারারই অঙ্গ এবং অন্যান্য আপতিক ঘটনা দিয়ে তাদের পরিপূরণ হয়ে যায়। কিন্তু বিকাশধারার ত্বরান্বয়ণ অথবা বিলম্বন খুব বেশি পরিমাণে নির্ভর করে এই ধরনের আপতিকতার উপর। যাঁরা গোড়াতেই আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁদের চরিত্রও এই আপতিকতার অন্তর্ভূক্ত।'

ডক্টরাল থিসিস রচনার পরও মার্ক্স অনেকবারই এপিকুরস প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন। যেমন, এঙ্গেলস-এর সহযোগে রচিত 'পবিত্র পরিবার'-এ (১৮৪৫) তিনি লিখেছেন, সতের শতকে রেনে দেকার্ত প্রবর্তিত দ্বয়বাদের (ভৌত বিষয়ের জন্য যান্ত্রিকতা এবং মানসিক বিষয়াবলীর জন্য অভিজ্ঞতা-ঊর্দ্ধ বুদ্ধিবাদ) বিরুদ্ধে এপিকুরীয় বস্তুবাদকে পুনরুজ্জীবিত করেন পিয়েরে গাঁসদি। ফরাসি ও ইংলিশ বস্তুবাদ সবসময়ই দেমক্রিতস ও এপিকুরস-এর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে

সম্পর্কিত। মার্ক্সও এঙ্গেলস-এর আরেকটি যৌথ রচনা 'জার্মান ভাবাদর্শ'-তে (১৮৪৬) আমরা পাচ্ছি, এপিকুরস ছিলেন প্রাচীন কালের সত্যিকার বিপ্লবী আলোক দানকারী (Enlightener), যার প্রভাব 'দীপায়ণ' (Enlightenment) পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এপিকুরসই যুক্তি দেখিয়েছিলেন, দুনিয়াকে ভ্রান্তিমুক্ত করা দরকার, বিশেষত ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের ভয়ের ভ্রান্তি থেকে, কারণ 'বিশ্ব আমার বন্ধু'। আমরা এপিকুরসেই প্রথম পাই, রাষ্ট্র মানুষের পাস্পরিক বোঝাপড়া বা সামাজিক চুক্তির উপর স্থাপিত। থিসিস রচনার বিশ বছর পরও তিনি ফার্দিনান্দ লাসালে-কে চিঠিতে ব্যাখ্যা করেছেন, এপিকুরস কিভাবে দেমক্রিতস-এর যুক্তিগুলোকে উল্টে দিয়েছেন। এভাবে মার্ক্স এপিকুরসকে শুধুমাত্র নিজের দর্শনে আত্মীকৃত করেই নেননি, এপিকুরসকে দুনিয়ার সামনে নতুনভাবে উপস্থাপনও করেন। মার্ক্সের এপিকুরস দেমক্রিতস-এর মামুলি অনুসারীমাত্র নন, তিনি স্বমহিমায় ভাস্বর একজন গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দার্শনিক। আর এপিকুরস তথা গ্রীক দর্শন পর্যালোচনার মাধ্যমেই মার্ক্সতার নিজের দর্শনের সূত্রপাত করেন।

পরিশিষ্টঃ মার্ক্স কি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ?

মার্ক্স-উত্তর মার্ক্সবাদীদের মধ্যে বিভিন্ন ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা এবং প্রকৃতির সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে দুটি ধারা স্পষ্ট। এসবের পক্ষে রয়েছেন ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫), গেওর্গি প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮) ও ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪); বিপক্ষে গেওর্গ লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১) ও আন্তনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭)। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পক্ষের অভিযোগটিকে তিনটি ভাগ করে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রথম অভিযোগ, 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' প্লেখানভের উদ্ভাবন; মার্ক্সবা এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কথা বলেন নি। তথ্যগতভাবে অভিযোগটি সত্য। মার্ক্সীয় দর্শন বুঝাতে প্লেখানভই এই শব্দবন্ধটি প্রয়োগ করেন। তবে মার্ক্স, হেগেলের ডায়ালেক্টিকসের সঙ্গে তার নিজের ডায়ালেক্টিকসের পার্থক্য বুঝাতে 'বস্তুবাদী ডায়ালেক্টিকস' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন এবং নিজেকে 'বস্তুবাদী' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা দ্বান্দ্বিকতার চেয়ে বস্তুবাদের উপর জোর দিয়ে, যান্ত্রিকতা ও প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ঝোঁকে পড়েছেন। এ অভিযোগটি গুরুতর এবং এর সত্যতা রয়েছে। লেনিনোত্তর 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী' শিবিরে এসব ঝোঁক প্রবল। এঙ্গেলস তার 'ডায়ালেক্টিকস অব নেচার'-এর অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিতে খসড়া আকারে দ্বান্দ্বিকতার তিনটি সূত্র লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এগুলি (১) পরিমাণের গুণে এবং গুণের পরিমাণে রূপান্তর। (২) বিপরীতের পরস্পর অনুপ্রবেশ্যতা (৩) নেতিকরণের নেতিকরণ। পরবর্তী সময়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা সামগ্রিকভাবে দ্বান্দ্বিক চিন্তাপদ্ধতিকে বাদ দিয়ে, উপরের তিনটি সূত্রকে সর্বত্র প্রযোজ্য বৈজ্ঞানিক সূত্ররূপে, সবকিছুকে ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, যোসেফ স্তালিন (১৮৭৯-১৯৫৩) তার 'দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' (১৯৩৮) রচনায় কোনো উল্লেখ না করেই 'নেতিকরণের নেতিকরণ' সূত্রটিকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। একই সময়ে রচিত কিন্তু পরে প্রচারিত 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' (১৯৩৭) রচনায় মাও সে তুঙ (১৮৯৩-১৯৭৬) দাবী করেন, দ্বন্দ্বের সূত্র একটিই, 'বিপরীতের ঐক্য এবং সংগ্রাম'। পরিমাণের গুণে এবং গুণের পরিমাণে রূপান্তর, বিপরীতের ঐক্য এবং সংগ্রামেরই বিশেষ রূপ মাত্র। তিনি দ্বন্দ্বকে প্রধান-অপ্রধান ও বৈর-অবৈর দ্বন্দ্বে ভাগ করেন। তারপর দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং এভাবে সূত্রটিকে সমৃদ্ধ করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'নেতির নেতি' সূত্রটি পরিত্যাগের ব্যাপারে স্তালিন ও মাও সে তুঙ একমত। কিন্তু মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন ব্যবহৃত এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি কেন বাদ দেওয়া হল, তার কারণ সম্বন্ধে তারা কিছু বলেন নি। অবশ্য আরো পরে মাও সে তুঙ, এঙ্গেলস প্রস্তাবিত তিনটি সূত্রকে খ্রিস্টীয় ট্রিনিটি (ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা ও ঈশ্বরপুত্র) বলে ঠাট্টা করতেন। ১৯৬৪ সনে তিনি ঘোষণা করেন, 'নেতিকরণের নেতিকরণ-এর মতো বাস্তবে কিছু নেই। ইতিকরণ, নেতিকরণ, ইতিকরণ, নেতিকরণ... বস্তুর বিকাশে ঘটনাবলীর শিকলে প্রতিটি সংযোগ হচ্ছে ইতিকরণ ও নেতিকরণ উভয়ই।'

একটু চিন্তা করলে দেখতে পারেন, বিপরীতের ঐক্য এবং সংগ্রাম সুত্রটি বস্তুর পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করে বটে; পরিবর্তনের গতিমুখ নির্দেশ করে না। পরিবর্তনের ফলে বস্তুটির সংগঠন সরল থেকে জটিল, কিংবা জটিল থেকে সরল হয়ে উঠবে কি না, এ-সুত্র তা বলে না। সভ্যতার উত্থান পতনের মাঝেও মানুষের জ্ঞানভান্ডার ক্রমেই সমৃদ্ধ ও বিকশিত হচ্ছে। অবিরাম ভাঙ্গা গড়ার মধ্যেও পদার্থ ও শক্তির একটি অপৃথকীকৃত অবস্থা থেকে ক্রমে মৌলকণিকা, মৌলপদার্থ, যৌগ, প্রাণ ও মনের উদ্ভব ঘটেছে। এসব বিকাশের কথা মার্ক্সবাদী কিংবা মার্ক্সবাদ বিরোধী সবাই স্বীকার করেন। মার্ক্সবাদীরা বলেন মানুষের ইতিহাসও প্রগতির পথে আগাচ্ছে। অনেক মার্ক্সবাদ বিরোধী ইতিহাসের পরিবর্তনের কথা স্বীকার করলেও প্রগতিতে বিশ্বাসী নন। প্রশ্ন হল, দ্বন্দ্ববাদের কোন সুত্রে এই সর্বব্যাপ্ত বিকাশ কিংবা প্রগতিকে ব্যাখ্যা করা যাবে। একমাত্র নেতিকরণের নেতিকরণ সূত্রই এই বিকাশ কিংবা প্রগতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কোনো কোনো গবেষকের মতে, মাও যে দ্বন্দ্ববাদের একটি সুত্রকেই মেনে নিয়েছিলেন এর পিছনে কার্যকর ছিল চীনা ঐতিহ্য। খ্রিস্টপূর্ব চার শতক থেকেই চীনা দার্শনিক ঐতিহ্যে 'ঈন ও ঈয়াং' (Yin and Yang) নামক ধারণাটির সাক্ষাৎ মেলে। সে ধারণা অনুসারে, 'ঈন ও ঈয়াং' এ-দুই পরস্পর বিপরীত কিন্তু পরস্পরের পরিপূরক বিষয় দিয়েই মহাবিশ্ব গঠিত। যেমন, আলো-আঁধার, গরম-ঠাণ্ডা, পুরুষ-স্ত্রী ইত্যাদি। এ-দুয়ের দ্বন্দ্বই সব পরিবর্তনের মূল কারণ। পরিবর্তনের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কখনো ঈন, কখনোবা ঈয়াং একে অন্যের উপর প্রধান্য বিস্তার করে। চীনা সংস্কৃতিতে এই তত্ত্বের প্রভাব অন্ত্যন্ত গভীর। চীনের ঐতিহ্যবাহী আকুপাংচার চিকিৎসাপদ্ধতি, চৈনিক শিল্পতত্ত্ব, মার্শাল আর্ট, সবই এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনের শেষ পর্যায়ে মাও সমাজ-প্রগতি সম্বন্ধে মার্ক্সবাদীদের মধ্যে প্রচলিত সরল আশাবাদের প্রতি সংশয়ী হয়ে পড়েছিলেন। যেখানে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই 'সংশোধনবাদের বীজ' রয়ে গেছে, সেখানে অবিরাম প্রগতিকে তার কাছে 'মিরাকল' বলেই মনে হয়েছে। তিনি যে নেতিকরণের নেতিকরণ সুত্রটিকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এর পিছনে তার সে-সময়কার মনোভাব কার্যকর ছিল।

দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয় অভিযোগ, প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা এবং প্রকৃতির সার্বভৌমত্ব এঙ্গেলসের আবিষ্কার। মার্ক্সের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। এর জবাবে প্রথম পক্ষীয়রা বলেন, প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা আলোচিত হয়েছে এঙ্গেলসের 'অ্যান্টি ড্যুরিং' ও 'ডায়ালেক্টিকস অব নেচার' রচনায়। মার্ক্সও এঙ্গেলস নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়েছিলেন। মার্ক্স রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র গবেষণায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। এঙ্গেলসের ক্ষেত্র ছিল প্রকৃতিবিজ্ঞান। মার্ক্সের অনুরোধেই এঙ্গেলস 'অ্যান্টি ড্যুরিং' রচনা করেছিলেন। বইটির অর্থনীতি বিষয়ক

অধ্যায়গুলি মার্ক্সের রচনা। প্রকৃতিবিজ্ঞান বিষয়ে এঙ্গেলসের মতামতকে মার্ক্স মান্য করতেন। কাজেই প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা এঙ্গেলসের একক বিষয় নয়। ['ডায়ালেক্টিকস অব নেচার' গ্রন্থটি রচনার সময় ১৮৭৩-১৮৮৬। ১৮৮৩ সনে মার্ক্সের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস মার্ক্সের 'পুঁজি' সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে প্রকাশ করার কাজে নিয়োজিত হন। ফলে তার নিজের প্রকল্প 'ডায়ালেক্টিকস অব নেচার' সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। এই অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর ত্রিশ বছর পর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। বইটির ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকায় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জে বি এস হলডেন (১৮৯২-১৯৬৪) মন্তব্য করেন, বিজ্ঞানী মহলে বইটি যথাসময়ে প্রচারিত হলে পদার্থ বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলি আরো মসৃণ হতে পারত।] দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের উপরে বর্ণিত যুক্তিগুলি পরোক্ষ। কিন্তু আমরা তো মার্ক্সের থিসিসটিতেই দেখলাম, মার্ক্স স্পস্টভাবেই বলেছেন, প্রকৃতির সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ছাড়া কোনো ধরনের বিজ্ঞানই অসম্ভব। এপিকুরস এই সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেন নি বলে মার্ক্স এপিকুরীয় দর্শনকে 'বস্তুবাদীতার ভান' বলতেও ছাড়েন নি। পরমাণুর গতি সম্বন্ধে এপিকুরসের ধারণাকে মার্ক্স প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন।

মার্ক্সবাদে দ্বিতীয় ধারাটির সূচনা, প্রথম ধারার যান্ত্রিকতা ও প্রত্যক্ষবাদী ঝোঁকের প্রতিক্রিয়ায়। এঁরা বস্তুবাদিতাকে খাটো করে জোর দিয়েছেন দ্বান্দ্বিকতায়। এঁরা প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতাকে বাদ দিয়ে জোর দিয়েছেন, বিশ্ব ঐতিহাসিক চেতনার (world historical consciousnes) দ্বান্দ্বিক উন্মোচনের উপর। এঁরা বলেন, মানুষের অনুশীলনের বাইরে কোনো স্বাধীন প্রকৃতি নেই। এই বিশেষ প্রসঙ্গটি বাদ দিলে, লুকাস ও গ্রামসির রচনা মার্ক্সীয় চিন্তাপ্রক্রিয়ার সৃজনশীল বিকাশ। লুকাচের 'History and Class Consciousnes' (১৯২৩) এবং গ্রামসির 'Prison Notebooks' (১৯২৯-৩৫) মার্ক্সীয় সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারায় যারা যান্ত্রিকতা ও প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দুষ্ট নন, এদেরই একজন ক্রিস্টফার কডওয়েল (১৯০৭-১৯৩৭)। কডওয়েল এই দুই শিবিরের প্রকৃতির সার্বভৌমত্ব বিষয়ে বিতর্কের দার্শনিক সমাধান দেন। তার মতে, 'মন আগে না বস্তু আগে' এই প্রশ্নের সঙ্গে 'বিষয়ী আগে না বিষয় আগে' এ প্রশ্নকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। অর্থাৎ সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্ন দুটির মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। মানুষের জানার কিংবা কর্মের ক্ষেত্রে বিষয়হীন বিষয়ী কিংবা বিষয়ীহীন বিষয় বলে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকেই জানি, বস্তু তার রূপান্তরের মধ্যেও চির অস্তিত্বশীল। আর মন সম্পন্ন বিষয়ীর উদ্ভব হয়েছে আমাদের গণনীয় সময়ে। দেকার্ত ভেবেছিলেন, চিন্তা করাটাই বুঝি চিন্তাকারীর অস্তিত্বের সমর্থনে সবচেয়ে নিঃসংশয় প্রমাণ। তার প্রবাদ প্রতিম উক্তি, 'আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি'। কডওয়েল স্মরণ করিয়ে দেন, চিন্তা করতে পারার আগেই চিন্তাকারীকে অস্তিত্বশীল হতে হয়। তাই কডওয়েল বলেন, 'আমি জীবন ধারণ করি, তাই আমি চিন্তা করি আমি আছি'। কডওয়েলের গুরুত্বপূর্ণ রচনা, 'Illusion and Reality', 'Studies in a Dying Culture' ও 'Crisis in Physics'। যান্ত্রিকতা ও প্রত্যক্ষবাদিতা বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর এসব একপেশেমির পরিপুরক হিসাবে রয়েছে, সেক্যুলার কিংবা ধর্মীয় রহস্যবাদিতা। বুর্জোয়া সংস্কৃতির ভিতর জন্ম নেওয়া ও জীবনযাপন করা আমাদের চিন্তাচেতনায়, উপরিউক্ত ধ্যানধারণাগুলো কতটুকু শেকড় ছড়িয়ে আছে সে সম্বন্ধে আমরা খুব কমই সচেতন। ফলে বেশীর ভাগ সময় আমাদের আদর্শ বামপন্থী কিন্তু আমাদের চিন্তাপ্রক্রিয়া ডানপন্থী। লুকাচ-গ্রামসি-কডওয়েল পাঠ আমাদেরকে চেতনার এই বিভাজন কাটাতে সাহায্য করবে।

বিরঞ্জন রায়: মনোরোগ চিকিৎসক ও লেখক
ইমেইল: bibhanranjan@gmail.com

তথ্যসূত্র ঃ

১. Karl Marx, The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature, Online Version: Brian Basgen Internet Archive (www.marxists.org) 2000.

২. Karl Marx, *Notebooks on Epicurean Philosophy*, Lawrence & Wishart Electronic Book, 2010.

৩. John L. Stanley, The Marxism of Marx's Doctoral Dissertation, *Journal of the History of Philosophy*, Volume 33, Number 1, January 1995, Published by Johns Hopkins University Press.

৪. John Bellamy Foster, *Marx's Ecology*, Cornerstone Publication, Kharagpur, 2001.

৫. *A Dictionary of Marxist Thought* (2nd ed.), Edited by Tom Bottomore and others, Worldview Publications, Delhi, 1991.

৬. Andy Blunden, *An Interdisciplinary Theory of Activity*, Brill, Leiden, 2010.

৭. David Riazanov, Karl Marx & Frederick Engels, *An Introduction to Their Lives and Work*, 1st NBA Edition, Kolkata, January 2011.

৮. Pike, Jonathan E. (1995) Marx, Aristotle and beyond: aspects of Aristotelianism in Marxist social ontology. PhD thesis. http://theses.gla.ac.uk/3480/

৯. Helena Sheehan, *Marxism and the Philosophy of Science: A Critical History*, Humanities Press International, Inc. USA, 1993.

১০. www.epicurus.net

১১. http://classics.mit.edu/Carus/nature_things.mb.txt

১২. http://plato.stanford.edu/archives

১৩. কার্ল মার্ক্স, ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ, *জার্মান ভাবাদর্শ*, মার্ক্স-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলি (বারো খন্ডে), প্রথম খন্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯।

১৪. কার্ল মার্ক্স, ডক্টরাল থিসিস, অনুবাদ ঃ জাভেদ হুসেন ও নাজমুল হাসান, বাঙলায়ন, ঢাকা, ২০০৮।

১৫. ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান, *মার্ক্স-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী*, দশম খন্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২।

১৬. গেনরিখ ভলকভ, *একটি প্রতিভার জন্ম* (কার্ল মার্ক্সের ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ), অনুবাদ : প্রভাত দাশগুপ্ত ও সুনীল মিত্র, বাঙলায়ন, ঢাকা, ২০১৪।

১৭. পিটার অসবর্ন, *হাউ টু রিড মার্ক্স*, অনুবাদ : জাভেদ হুসেন ও অন্যান্য, বাঙলায়ন, ঢাকা, ২০১১।

১৮. পারভেজ ইমাম, *হেগেল: জীবন ও দর্শন*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১০।

১৯. বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, *হেগেল পরিচয়*, পাভলভ ইনষ্টিটিউট, কলকাতা, ২০১৩।